Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 40
Website: https://tirj.org.in, Page No. 301 - 308
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 301 - 308
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

রবীন্দ্রনাথের সমবায় ভাবনা ও ‘রাশিয়ার চিঠি’ : রবীন্দ্র মনন ও চিন্তনের বিশিষ্ট প্রকাশ

ড. ধ্রুব মুন্সী
Email ID: munsidhruba@gmail.com

Received Date *16. 03. 2024*
Selection Date *10. 04. 2024*

Keyword
Co-operative, Russiar Chithi, Rabindranat, agriculture, Education, Health, State, Society.

Abstract
‘Co-operative’ is the combined action and purpose of all— the combined result of these two thoughts. That is, if people with the same thinking are motivated by the ideals of democracy and engaged in the pursuit of social and economic welfare while maintaining equality, then that system is called co-operative. Co-operative principle basically means that all works for all, each works for the other. The combined efforts of co-operatives can move society, country and nation forward. Rabindranath used this idea of rural development. The journey to Russia opened up new horizons for Rabindranath's social thought. He has witnessed in his long journey how co-operatives can be used to make society and people stand up, to build the backbone of the country and nation. Where is the need for this thinking in today's changing world? How co-operative thinking can be used in human and state formation will be discussed in the main article.

Discussion

রবীন্দ্র মনন ও চিন্তনের এক বিশিষ্ট প্রকাশ ‘রাশিয়ার চিঠি’। ১৯৩০ এ রাশিয়া যাত্রায় রাশিয়াকে যেভাবে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন তাই তিনি ব্যক্ত করেন এই চিঠির সংকলন গ্রন্থটিতে। বিবিধ চিঠির কোলাজ রাশিয়ার চিঠি প্রবন্ধটি তাঁর ভারত ভাবনারও দীর্ঘ বিন্যাস। আমরা সকলেই জানি জমিদারি দেখাশোনার কাজে গিয়ে তাঁর ভারতের পল্লী মানুষ ও পল্লী জীবনের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। সেই জীবন ও মানুষের কাহিনি, সমাজ, সমকাল, পালাবদল, রাষ্ট্র, অর্থনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়কে তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর সাহিত্যে। তাঁর এই পল্লী ভাবনা তথা ভারত ভাবনার এক বিশিষ্ট প্রকাশ প্রবন্ধটি। তবে নামেই বোঝা যায় যখন চিঠি তখন তা হবে খোলামেলা অবকাশপূর্ণ। কাহিনি পরিবেশনের দায় লেখকের এখানে নেই। জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে তিনি ঘুরে তাকিয়েছেন। পর্যালোচনা করেছেন ভারতবাসীর। ভারতবাসী যা করতে পারেনি তা করে দেখিয়েছে সোভিয়েত রাশিয়া। তাদের মার্কসবাদী সমাজতান্ত্রিক ধারণায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে সমবায় ভাবনার উপর। রাশিয়া সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে, শিক্ষাকে সর্বক্ষেত্রে উন্মুক্ত করে এক নতুন উদ্যমকে সূচিত করেছে।

আমাদের দেশ ভারতবর্ষ যেমন গ্রাম নির্ভর একটি দেশ তেমনি কৃষক ও কর্মিক মানুষের দেশ। ভারতবর্ষের অর্থনীতি মূলত গ্রামীন অর্থনীতি। অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে। এমনকি সমাজের অধিকাংশ মানুষ যেমন কৃষিজীবী, তেমনি নিরক্ষর। কিন্তু তারাই সঠিকভাবে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করতে পারেনা। উপরন্তু উপার্জনের ক্ষেত্রে এরা সবার নীচে। আমাদের এই সব অসহায়, লাঞ্ছিত, পীড়িত দারিদ্র্য মানুষদের জীবনে আশার আলোর বড় অভাব। এর কারণ অবশ্যই অর্থনৈতিক বৈষম্য। পুঁজিবাদী মানসিকতা জন্ম দিয়ে ভোগ ও লোভের সামনে ভেঙে পড়ে সমাজ ও সাধারণ মানুষ। এ ক্ষেত্রে প্রকৃত উন্নয়ন কীভাবে সম্ভব? এই উন্নয়ন সমবায় নীতির দ্বারাই গড়ে ওঠা সম্ভব। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বারবার গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন এই সমবায় ভাবনার উপরে। এতে শুধু রাষ্ট্রিক উন্নতি নয় বরং হেরে যাওয়া খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষও একদিকে যেমন উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করতে পারবে, তেমনি তারা নিজেদের জীবনের মানোন্নয়ন ঘটাবে। সব রকমের দলাদলি, নীচতা, ভয় প্রভৃতি যা যা মানুষকে শোষিত মানুষে পরিণত করে ও সর্ববিধ মানবিক গুণকে অপসারিত করে তা দূর করতে সহায়তা করবে এই সমবায় কাঠামো। আত্মশক্তিকে জাগ্রত করে আর্থসামাজিক অসাম্য দূর করে সাম্য প্রতিষ্ঠার পথকে সুদৃঢ় করবে। সোভিয়েত রাশিয়ার এই সাম্যের নবনির্মিত কাঠামোকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন।

আসলে কবিগুরু জমিদারী দেখাশোনার কাজে শিলাইদহে গিয়ে গ্রামবাসীদের সংস্পর্শে এসে সমবায় নীতির গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন বলেই 'চিত্রা' কাব্যের 'এবার ফিরাও মোরে' (২৩ ফাল্গুন, ১৩০০) কবিতায় তিনি লিখেছিলেন-

"... এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা; ডাকিয়া বলিতে হবে-
মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাড়াও দেখি সবে!
যার ভয়ে তুমি ভীত, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।"[১]

স্বভাবতই দারিদ্র্য পীড়িত হতাশাগ্রস্ত মানুষের মনে রবীন্দ্রনাথের এই উৎসাহ, উদ্দীপনা, সাহস ও মুক্তির বাণী আশার আলো জাগাতে পারে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এই সমবায় ব্যবস্থা। রবীন্দ্রনাথের কাছে ইউরোপের সমবায় নীতি হল এমন একটি মাধ্যম যেখানে অনেক গৃহস্থ মানুষ একজোট হয়ে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে। তাই কবি গুরু বলেছেন—

> "ভারতবর্ষে আজ দারিদ্র্যই বহুবিস্তৃত, - এই জন্যই সমবায় নীতি ছাড়া আমাদের উপায় নেই। তিনি আরও স্পষ্ট করে জানিয়েছেন— আমার কাছে মনে হয়, এই কোঅপারেটিভ — প্রণালীই আমাদের দেশকে দারিদ্র্য হইতে বাঁচাইবার একমাত্র উপায়।"[২]

অর্থাৎ এই সমবায় নীতির প্রয়োজনীয়তা শুধুমাত্র ভারতবর্ষে নয়, বিদেশেও যে প্রয়োজন ছিল তা কবিগুরু বেশ ভালভাবে অনুধাবন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল এই সমবায় নীতির ফলে পরস্পর সম্মিলিত মানুষের ত্যাগ, তপস্যা, ও মৈত্রী বন্ধনের দ্বারা ঐক্যের শক্তি জাগরিত হবে। ফলস্বরূপ এই শক্তিই মানুষের মন থেকে উদাসীনতা, অপরাধবোধ, অভিশাপ, দারিদ্র্যের অভাব দূর করবে।

সমবায় অর্থাৎ সকলকে একত্রিত করে কর্মিকে বাড়িয়ে তোলা। কৃষিক্ষেত্রে সমবায় ভাবনা আনতে পারে যুগান্তর। তবে এর সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত হতে হবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়কে। শুধুমাত্র ঋণদানের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে সমবায় ভাবনা পরিচালিত হলে চলবে না। কারণ তা জমিদার বা আমলাতন্ত্রেরই ভিন্নরূপ হয়ে দাঁড়াবে। রবীন্দ্রনাথ কুটিরশিল্পের ওপরেও গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। আমরা উক্ত প্রবন্ধ অবলম্বনে সমবায় নীতি কি এবং কেন, সোভিয়েত রাশিয়ায় সমবায়ের গতিপ্রকৃতি, ভারতের সমবায় কাঠামো ও তার বর্তমান অবস্থা প্রভৃতি বিষয়কে পর্যালোচনা করব।

পল্লী উন্নয়নকামী রবীন্দ্রনাথ কখনোই জমিদার তন্ত্রকে সর্বতোভাবে স্বীকার করেননি। তাঁর লেখা চিঠিতে আমরা এর উল্লেখ পাই—

> "যে রকম দিন আসছে তাতে জমিদারির উপরে কোনদিন আর ভরসা রাখা চলবে না। ও জিনিসটার উপর অনেক কাল থেকেই আমার মনে মনে ধিক্কার ছিল, এবার সেটা আরও পাকা হয়েছে। যে সব কথা বহুকাল ভেবেছি

> এবার রাশিয়ায় তার চেহারা দেখে এলুম। তাই জমিদারী ব্যবসায়ে আমার লজ্জা বোধ হয়। আমার মন আজ উপরের তলার গদি ছেড়ে নীচে এসে বসেছে।”[৩]

রবীন্দ্রনাথ যখন সমবায়ের কথা ভাবছেন তখনো কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়নি। তার পূর্বেই তিনি নিজস্ব উদ্যোগে গ্রামে সমবায় ব্যাঙ্কের প্রারম্ভিক রূপ নির্মাণ করেন। এই সমবায় ভাবনার ধারণাটি তার মনে দৃঢ় হয় আয়ারল্যান্ডের সম্পর্কে জেনে। আয়ারল্যান্ডের কবি ও কর্মবীর A.E রচিত ‘National Being’ গ্রন্থটি পড়ে তিনি সমবায় ভাবনা সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ হন। তার উদ্যোগ গ্রহণের বহু বছর পর জীবনের প্রায় শেষার্ধে তিনি তা প্রত্যক্ষ করেন রাশিয়ার জনমানসে। ততদিনে তিনি উপলব্ধি করে ফেলেছেন আমাদের দেশে সমবায় ব্যবস্থার ব্যর্থতার কথা। ১৯১৭ সালে রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব বদলে দেয় রাশিয়ার চিন্তাভাবনাকে। লেনিনিস্ট সমাজতান্ত্রিক ধারণাকে কার্যকরী করতে চায় চাষী ও কর্মিক মানুষদের মাধ্যমে। পুঁজিবাদী সভ্যতার বিপরীতে এই সব মানুষদের শিক্ষিত করে তার সঙ্গে যুক্ত করতে চান অর্থনীতি ও সমাজকে। সমবায় অর্থাৎ সকলের সমান মর্যাদা স্বীকার করে উৎপাদন বাড়ানো। উৎপাদন বাড়লেও অর্থ সকলের মধ্যে বর্তমান থাকবে। ধন এক জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকলে তা মনুষত্বকে ধ্বংস করে। বরং তা সর্ব মানুষে ছড়িয়ে দিলেই চিত্তের জাগরণ ও সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব। পূর্বে পল্লীর জীবনে আমরা যা প্রত্যক্ষ করে থাকি। সমবায় ভাবনা আলোচনাকালে রবীন্দ্রনাথ পূর্বতন পল্লী সমাজের রূপটিকে তুলে ধরেছেন—

> “একদিন ভারতের সমাজটাই ছিল প্রধানত পল্লীসমাজ। এই রকম ঘনিষ্ঠ পল্লীসমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে সমাজগত সম্পত্তির সামঞ্জস্য ছিল। লোকমতের প্রভাব ছিল এমন যে, ধনী আপনার ধন সম্পূর্ন আপন ভোগে লাগাতে অগৌরব বোধ করত। সমাজ তার কাছ থেকে আনুকূল্য স্বীকার করেছে বলেই তাকে কৃতার্থ করেছে, অর্থাৎ ইংরেজি ভাষায় যাকে চ্যারিটি বলে এরমধ্যে তা ছিল না। ধনীর স্থান ছিল সেখানেই যেখানে ছিল নির্ধন; সেই সমাজে আপন স্থানমর্যাদা রক্ষা করতে গেলে ধনীকে নানা পরোক্ষ আকারে বড়ো অঙ্কের খাজনা দিতে হত। গ্রামে বিশুদ্ধ জল, বৈদ্য, পন্ডিত, দেবালয়, যাত্রা, গান, কথা পথঘাট, সমস্তই রক্ষিত হত গ্রামের ব্যক্তিগত অর্থের সমাজমুখীন প্রবাহ থেকে, রাজকর থেকে নয়। এর মধ্যে স্বেচ্ছা এবং সমাজের ইচ্ছা দু'ই মিলতে পেরেছে। যেহেতু এই আদানপ্রদান রাষ্ট্রীয় যন্ত্রযোগে নয়, পরন্তু মানুষের ইচ্ছাবাহিত, সেই জন্যে এরমধ্যে ধর্মসাধনার ক্রিয়া চলত, অর্থাৎ এতে কেবলমাত্র আইনের চালনায় বাহ্য ফল ফলত না, অন্তরের দিকে ব্যক্তিগত উৎকর্ষ সাধন হত। এই ব্যক্তিগত উৎকর্ষই মানব সমাজের স্থায়ী কল্যাণময় প্রাণবান আশ্রয়।”[৪]

সমাজে বৈশ্যরা অর্থাৎ বণিকরা ছিল পতিত। কারণ গুরুত্ব পেত ধর্ম, ধন নয়। অথচ এই বণিকদের আগমনেই পল্লী ধারণার পরিবর্তন ঘটে। শহর কেন্দ্রীকরণে পিছিয়ে পড়ে পল্লীসমাজ। অর্থের গুরুত্ব বদলে দেয় সমাজজীবন। বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যখন সারাদেশে তোলপাড় অবস্থা সে সময় তিনি প্রচলিত স্রোতে না ভেসে গ্রামের স্বকীয় শাসনকার্যের দাবী করেন। ১৯০৬ এ তিনি তার পুত্র রথীন্দ্রনাথকে বিদেশে পাঠান কৃষিবিদ্যা পঠন-পাঠনের জন্য। পরবর্তীতে পুত্র রথীন্দ্রনাথ পিতার এই অভিপ্রায় অনুভব করে বলেছেন—

> “তাঁর ধারণা হয়েছিল গ্রামের আর্থিক জীবনের মেরুদণ্ড কৃষির উন্নতি না করতে পারলে দেশের উন্নতি অসম্ভব। এইজন্য তিনি স্থির করলেন বিদেশে গিয়ে সন্তোষ ও আমি যদি ভালো করে কৃষি ও পশুপালনবিদ্যা আয়ত্ত করে আসি তাহলে ফিরে এসে আমরা তাঁর দেশের কাজে সহায় হতে পারব।”[৫]

তাছাড়া পিতৃদেবের কাজের অভিপ্রায়ে রথীন্দ্রনাথ কতটা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তাঁর প্রমান মেনে নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা একটি পত্রে—

> “মুরগী ও হাসের ব্যবসাটা খুব সহজ হবে— সকলেই যদি দশটা বিশটা করে পাখি পোষে তাহলে ডিম ও পাখি সংগ্রহ করে আমি কলকাতায় পাঠাতে পারব; বেশ যখন চলতে থাকবে তখন নিজে ছেড়ে দিয়ে চাষারাই যাতে co-operative করে সেটা চালায় তার চেষ্টা করব। প্রথমে তারা co-operation বুঝবে না, ক্রমশ একদিকে co-operative dairying, bee-keeping— প্রভৃতি ও অন্যদিকে ডালা ঝুড়ি ছাতা প্রভৃতি তৈরী করার ব্যবসা introduce করতে হবে।”[৬]

রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে নগেন্দ্রনাথও ব্যবসায় যাতে নিজেকে আত্মনিয়োগ করে তার জন্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নগেন্দ্রনাথকে একটি পত্রে জানিয়েছেন-

> "রথীর কাজে তুমি যদি সহযোগী হতে চাও তাহলে ক্ষেত্র প্রস্তুত আছে। চাষাদের সঙ্গে co-operation এ চাষ করা, ব্যাঙ্ক করা... ঋণমোচন করা, ...বাঁধ বেঁধে দেওয়া, ...পরস্পরকে পরস্পরের সহায়তাসূত্রে আবদ্ধ করা, এমন কত কাজ আছে তার সীমা নেই।"[৭]

১৯০৪ সালে লর্ড কার্জনের সময় এই Co-operative Credit Societies Act আইনটি পাশ হয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের ঋণ দেওয়া ও সেখান থেকে পুঁজি সংগ্রহ করা। স্বদেশী আন্দোলনের পর বাংলাদেশের শিলাইদহে সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথ এই সমিতি গঠনের উদ্যোগ নেন। তাছাড়া পতিসরে সমবায় প্রথার কৃষি ব্যাঙ্ক তিনি স্থাপন করেন। এমনকি কবি গুরুর প্রচেষ্টায় ও সহায়তায় 'বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়। 'ভাণ্ডার' (১৯১৮) পত্রিকায় প্রকাশিত এই সমিতির মুখপত্রে রবীন্দ্রনাথ 'সমবায়' নামক শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখে সমবায় ব্যবস্থাকে জনপ্রিয় করে তোলেন। তবে রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন—

> "রবীন্দ্রনাথ যখন প্রজাদের মধ্যে সমবায় শক্তি জাগরুক করিবার কথা ভাবিতেছিলেন তখন বাংলাদেশে সরকারী কো-অপারেটিভ আন্দোলন আরম্ভ হয় নাই।"[৮]

প্রজাদের অর্থনৈতিক দুর্দশা এবং তাদের উপর মহাজনের অতিরিক্ত ঋণের পাহাড় রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত বিচলিত করেছিল। প্রজাদের এই দুর্দশা নিরসনের জন্য রবীন্দ্রনাথ ১৯০৫ সালে কালীগ্রাম পরগণার সদর পতিসরে 'পতিসর কৃষি ব্যাঙ্ক' নামে একটি সমবায় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন। এমনকি নোবেল পুরস্কার থেকে প্রাপ্ত কিছু অর্থ এই ব্যাঙ্কের কাজে বিনিয়োগ করলে অনেক মানুষ ঋণমুক্ত হওয়ার সুযোগ পায়। যার ফলস্বরূপ অনেক মহাজন ব্যবসা বন্ধ করে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নির্মিত সেই ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখতে আরম্ভ করেন। এই ব্যাঙ্ক প্রজাদের বছরে ১২ টাকা করে সুদ দিত এবং যারা টাকা জমা দিত তাদের বছরে শতকরা ৭ টাকা হারে সুদ দিত। ত্রিশ বছর ধরে এই ব্যাঙ্ক মানুষের জন্য কাজ করেছিল। ১৯০৮ পাবনায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনীর অধিবেশনে পল্লী উন্নয়নের ১৫ দফা কার্যবিধির মূল তত্ত্ব সকলের সম্মুখে উপস্থাপন করেন। যার মধ্যে গুরুত্ব পেয়েছিল কৃষি, শিক্ষা, চিকিৎসা, শিল্প, ধর্মগোলা প্রভৃতি। তার গুরুত্ব সেদিন বিশেষ কেউই স্বীকার করে নেননি। নিজস্ব উদ্যোগে পতিসর শ্রীনিকেতন শান্তিনিকেতনেই তিনি তাঁর ভাবনা রূপায়নের কর্মটি পরিচালনা করতে থাকেন। তার স্বদেশ ভাবনায় তিনি গুরুত্ব দেন এই সমবায়কে। সমবায়ে ঐক্য অন্তরের, এর সঙ্গে ব্যবসা গঠিত যোগের কোন সম্পর্ক নেই। এক্ষেত্রে তিনি গান্ধীজিকেও স্বীকার করেছেন তার হৃদয়ধর্মের গুনের কারণে। গান্ধীজী নিজেকে স্বতন্ত্র না করে হয়ে উঠেছেন সকলের। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন গান্ধীজি স্বদেশ ভাবনায় কুটির শিল্পের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও কুটির শিল্পের ধারণাকে গ্রহণ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের পল্লী ভাবনার আদর্শের মূলে ছিল সমবায় নীতিতে পল্লীর মানুষদের সুসংবদ্ধ করে কৃষি, স্বাস্থ্য, পশুপালন প্রভৃতির ব্যবস্থা করে সুস্থ, সবল, শোষণমুক্ত পল্লীসমাজ প্রতিষ্ঠা করা। সেই সময় ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য গ্রামের ডাক্তার গোপাল চন্দ্র চ্যাটার্জী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করলে রবীন্দ্রনাথ তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। এমনকি সমবায়ের স্বাস্থ্যোন্নতি ও পল্লী সংগঠন সমিতিকে সমবায় নীতির আইন অনুসারে রেজিস্ট্রি করার জন্য উপবিধির মাধ্যমে ছাপানোর ব্যবস্থা করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এই উপবিধির দ্বারা পল্লীর যাবতীয় সাংগঠনিক কাজ করা হত। ১৯৩২ সালে বোলপুর শহরের কাছাকাছি বাঁদগোড়া গ্রামে প্রথম সমবায় স্বাস্থ্যসমিতি গড়ে উঠেছিল। গ্রীণ নামে আমেরিকার জনৈক এক ভদ্রমহিলার প্রয়াসে গ্রামীন স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা পায়। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উপর ভিত্তি করে কালীমোহন ঘোষ বোলপুরের চারদিকের অঞ্চলে সমবায় স্বাস্থ্য সমিতিগুলি নির্মাণ করেছিলেন।[৯]

রবীন্দ্রনাথের কাছে গ্রামের চাষ এবং কুটিরশিল্প— এই দুটি সমবায়নীতির বিরাট সম্ভাবনার ফসল বলে মনে হয়েছিল। তবে আমাদের দেশে সমবায় নীতির অগ্রগতি যতটা প্রসারিত হওয়ার কথা ছিল, ততটা হয়নি। কারণ এটি উৎপাদনমুখী না হয়ে ঋণদানমুখী হয়ে উঠেছিল। তবে সত্যিকারের উন্নয়নের জন্য ঋণদান সমিতি অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু সমবায় ব্যবস্থায় উৎপাদনের কাজে অগ্রসর না হলে সমবায়ের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। এই জন্য রবীন্দ্রনাথ দুঃখের সঙ্গে জানিয়েছিলেন—

> "কো-অপারেটিভের যোগে অন্যদেশে যখন সমাজের নীচের তলায় একটা সৃষ্টির কাজ চলছে, আমাদের দেশে টিপে টিপে টাকা ধার দেওয়ার চেয়ে বেশি কিছু এগোয় না। কেন না, ধার দেওয়া, তার সুদ কষা এবং দেনার

> টাকা আদায় করা অত্যন্ত ভীরু মনের পক্ষেও সহজ কাজ, এমন কি ভীরু মনের পক্ষেই সহজ, তাতে যদি নামতার ভুল না ঘটে তাহলে কোনো বিপদ নেই।”[১০]

তিনি আরও আক্ষেপের সুরে জানিয়েছেন—

> “আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে সমবায় প্রণালী কেবল টাকা ধার দেওয়ার মধ্যেই ম্লান হয়ে আছে, মহাজনী গ্রাম্যতাকেই কিঞ্চিৎ শোষিত আকারে বহন করছে। সম্মিলিত চেষ্টায় জীবিকা-উৎপাদন ও ভোগের কাজে সে লাগল না।”[১১]

এছাড়া আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> “এখানে (রাশিয়ায়) এসে যেটা সবচেয়ে আমার চোখে ভালো লেগেছে, সে হচ্ছে ধনগরিমায় ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব এবং যাদের হাতে ধন, যাদের হাতে ক্ষমতা, তাদের হাত থেকে নির্ধন ও অক্ষমেরা এই রাশিয়াতেই অসহ্য যন্ত্রণা বহন করেছে। দুই পক্ষের মধ্যে একান্ত অসাম্য অবশেষে প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে এই রাশিয়াতেই তার প্রতিকার সাধনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত।”[১২]

রাশিয়ায় সমবায় ধারণা থেকে গড়ে উঠেছে ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্র। ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্র অর্থাৎ সকলের জমিকে একত্রিত করে চাষ করা। এখানে সমষ্টিকে গুরুত্ব দেওয়ার ফলে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিকে সর্বতোভাবে ব্যবহার করা যায়। ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তার ‘সমবায়নীতি’ প্রবন্ধে বলেছেন—

> “যদি প্রত্যেক চাষা কেবল নিজের ছোটো জমিটুকুকে অন্য জমি হইতে সম্পূর্ণ আলাদা করিয়া না দেখিত, যদি সকলের জমি এক করিয়া সকলে একযোগে মিলিয়া চাষ করিত, তবে অনেক হাল কম লাগিত, অনেক বাজে মেহন্নত বাঁচিয়া যাইত। ফসল কাটা হইলে সেই ফসল প্রত্যেক চাষার ঘরে ঘরে গোলায় তুলিবার জন্য স্বতন্ত্র গাড়ির ব্যবস্থা ও স্বতন্ত্র মজুরি আছে; প্রত্যেক গৃহস্থে স্বতন্ত্র গোলাঘর রাখিতে হয় এবং স্বতন্ত্রভাবে বেচিবার বন্দোবস্ত করিতে হয়। যদি অনেক চাষী মিলিয়া এক গোলায় ধান তুলিতে পারিত ও এক জায়গা হইতে বেচিবার ব্যবস্থা করিত তাহা হইলে অনেক বাজে খরচ ও বাজে পরিশ্রম বাঁচিয়া যাইত। যার বড়ো মূলধন আছে তার এই সুবিধা থাকাতেই সে বেশি মুনাফা করিতে পারে, খুচরো খুচরো কাজের যে-সমস্ত অপব্যয় এবং অসুবিধা তাহা তার বাঁচিয়া যায়।”[১৩]

তিনি উপলব্ধি করেছিলেন স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্র কৃষিপল্লী। তাই তাঁর অভিপ্রায় ছিল চাষীকে আত্মশক্তিতে দৃঢ় করে তোলা। তার মনে হয়েছিল জমির স্বত্ব ন্যায়সঙ্গত ভাবে চাষীর, তা জমিদারের নয় এবং সমবায় নীতিকে অনুসরণ করে জমিকে একত্রিত করে চাষ করলে তবেই কৃষির উন্নতি। কিন্তু এই দুটি পন্থাই ছিল অত্যন্ত কষ্টকর। কারণ-

> “চাষীকে জমির স্বত্ব দিলেই সে স্বত্ব পরমুহূর্তেই মহাজনের হাতে গিয়ে পড়বে, তার দুঃখভার বাড়বে বৈ কমবে না।”[১৪]

আমাদের দেশের শিক্ষাপদ্ধতি পুঁথিগত শিক্ষার বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে না। তাই চাষীদের যথাযোগ্য শিক্ষিত করে তাদের মনোভাব গড়ে তোলার মতো মানুষ, বুদ্ধির সাহস এবং জনসাধারণের প্রতি দরদবোধ প্রায়ই দুর্লভ। অন্যদিকে বিপ্লবোত্তর রাশিয়া অর্থ সম্বল কম এবং যথেষ্ট কারখানার অভাবে অর্থ উৎপাদনেও এরা পিছিয়ে। তাই নিজেদের টিকিয়ে রাখতে সমাজের নিচুতলার মানুষদের এদের জাগিয়ে তুলতেই হত।

সোভিয়েত রাশিয়া যে তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে তা হল শিক্ষা, কৃষি ও যন্ত্র। তারা উপলব্ধি করেছে এই তিনের মেলবন্ধনেই প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব। এই শিক্ষা পুঁথিগত শিক্ষা নয়, এই শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা। শিল্প, কৃষি, সাহিত্য, বিজ্ঞান সর্ববিষয়ে চাষী ও কর্মিক মানুষদের শিক্ষিত করার প্রচেষ্টা নিয়েছে সোভিয়েত রাশিয়া। শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভ্রমণ অর্থাৎ দেখে শেখার নীতিকে তারা গুরুত্ব দিয়েছে। শিক্ষাকে ইচ্ছা ও চেষ্টার সঙ্গে যুক্ত করে অর্থ উৎপাদনের শক্তিকে বাড়ানোর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তাদের। সমবায় নীতিকে গ্রহণ করে তারা যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবার সেগুলি আলোচনা করা যাক। তারা বিভিন্ন জায়গায় কৃষিভবন ও মিউজিয়াম নির্মাণ করেছে। কৃষি ভবন গুলিতে কৃষিবিদ্যা, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ দেওয়ার ব্যবস্থা, নিরক্ষরদের পড়াশোনা শেখানোর উপায়, বিশেষ ক্লাসের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক রীতিতে চাষ করার ব্যবস্থা বুঝিয়ে দেওয়া প্রভৃতি কর্ম পরিচালিত হয়ে থাকে। চাষীরা শহরে এলে খুব কম খরচে অন্তত তিন সপ্তাহ এই রকম বাড়িতে থাকতে পারে। অন্যদিকে মিউজিয়ামগুলি কলাসাধনার অঙ্গ করে তুলেছে সাধারণ মানুষদের। প্রথমাবধি রবীন্দ্রনাথের মনে সংশয় দানা বাঁধলেও পরিদর্শন এবং চাষী ও কর্মিক মানুষদের সঙ্গে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 40
Website: https://tirj.org.in, Page No. 301 - 308
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আলোচনার মাধ্যমে তার সংশয় দূরীভূত হয়। বিভেদ ও দলাদলির রাজনীতিকে দূরে সরিয়ে তারা মিলনকে স্বীকার করেছে। একক কৃষিক্ষেত্রের তুলনায় ঐক্যত্রিক কৃষিক্ষেত্রে ফসল উৎপন্ন হয় দ্বিগুণ। চাষীরা আট ঘন্টা পরিশ্রম করে এবং প্রতি পঞ্চম দিনে ছুটি গ্রহণ করে। যারা নির্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত অর্থাৎ ওভারটাইম করে তারা উপরি পারিশ্রমিক পায়। শীতের সময় চাষীরা শহরে বাড়ি তৈরি ও রাস্তা মেরামতের কাজ করে। এই অনুপস্থিতিতেও তারা বেতনের এক-তৃতীয়াংশ এবং পরিবারের লোকের তাদের নির্দিষ্ট ঘরে বাসের সুযোগ তারা পায়। অবসর সময়ে তারা অভিনয় করে থিয়েটার, সিনেমা দেখে, গল্প পড়ে, গল্প বলে, তর্ক সভা, সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক সভায় অংশগ্রহণ করে। ছুটির দিনে পরিষ্কার কর্ম, অতিরিক্ত পড়া এবং ভ্রমণে নিজেদের নিয়োজিত করে। অর্থাৎ যাবতীয় ফাঁককে এরা লোক হিতকর কর্ম দিয়ে পূর্ণ করেছে। সমগ্র ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের ধারণা স্বচ্ছ। এক চাষীর বক্তব্যে আমরা তা উপলব্ধি করতে পারি—

> "প্রায় গোড়াতেই আমাদের এই ঐকত্রিক চাষে দেড়শো চাষীর খেত মিলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৯২৯ সালে অর্ধেক চাষী তাদের খেত ফিরিয়ে নিলে। তার প্রধান কারণ, সোভিয়েট কম্যুন দলের প্রধান মন্ত্রী স্ট্যালিনের উপদেশ আমাদের কর্মচারীরা ঠিকমত ব্যবহার করেনি। তাঁর মতে, ঐকত্রিকতার মূলনীতি হচ্ছে সমাজবদ্ধ স্বেচ্ছাকৃত যোগ।"[১৫]

সমবায়ের ফলে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগের একান্ত স্বাতন্ত্র সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। সেই সীমার বাইরের উদ্বৃত্ত সর্বসাধারণের জন্য ছাপিয়ে যাওয়ায় সম্পত্তির মমত্ববোধ লুব্ধতায় বা নিষ্ঠুরতায় পৌঁছয় না। ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নারী উন্নয়ন। সাইবেরিয়ার এক চাষী স্ত্রীলোকের কাছ থেকে আমরা জানতে পারি ১০ বছরে তাদের বদল ঘটেছে অসামান্য। আত্মশক্তিতে ভর করে তারা গঠন করেছে মেয়ে ঐকত্রিকের দল, যারা বিভিন্ন প্রদেশে ঘুরে পিছিয়ে পড়া মেয়েদের মধ্যে কাজ করে। তাদের জীবনযাত্রার মানকে সহজ করার জন্য প্রত্যেক ঐকত্রিক ক্ষেত্রে নির্মিত হয়েছে শিশুপালনাবাস, শিশু বিদ্যালয় ও সাধারন পাকশালা।

এই ধরনের কৃষিক্ষেত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ যন্ত্র। বিজ্ঞানসম্মত সারের প্রয়োগ এবং কলের লাঙ্গল ব্যবহার চাষকে সুদৃঢ় ভিত্তি প্রদান করেছে। এরা অন্যতম যে উদ্যোগটি গ্রহণ করেছে তা হল আরামবাগ (Moscow park of education and recreation) নির্মাণ। এখানে প্রদর্শনীতে দেশ-বিদেশের যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা যায়, মডেলের মাধ্যমে পুরনো ও নতুন গ্রামের ধারনাকে প্রকাশ করা হয়, আদর্শ ক্ষেত, সোভিয়েত আমলে সোভিয়েত কারখানায় নবনির্মিত যন্ত্রের নমুনা, কো-অপারেটিভের সুবিধা, বিপ্লব ও বিপ্লব পরবর্তী জীবন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জনসাধারণকে জানানো হয়। রয়েছে পার্ক যার একাংশ শুধু শিশুদের জন্য বরাদ্দ, রয়েছে শিশুরক্ষণী যেখানে বাবা মায়েরা শিশুদের রেখে পার্কে ঘুরে বেড়াতে পারে, রয়েছে লাইব্রেরী, আহারের জন্য কো-অপারেটিভ, রয়েছে কো-অপারেটিভ স্বাস্থ্যাগার। এছাড়াও সোভিয়েত রাষ্ট্রসঙ্ঘে রয়েছে কো-অপারেটিভ সোসাইটি যার নাম বিশ্রান্তিনিকেতন। এছাড়া এদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল সজীব সংবাদপত্রের ধারণা। ঠিক মতো করে সঠিক তথ্যকে জানা এবং তাদের সম্বন্ধে চিন্তা করে কাজকে খাঁটি করার জন্য এরা দেশের সম্বন্ধে অনেক খবর সংগ্রহ করে এবং তা নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। অবশ্য উন্নয়নের এই বিশালতার মধ্যেও গলদটিকে রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এই কাঠামো সবটাই ছাঁচে ঢালা। ছাঁচের জোড়কে দূরে সরিয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বতঃস্ফূর্ততাকে বরণ করতে চেয়েছেন। জোড় অর্থেই পতন অনিবার্য। এখানেই তার প্রভেদ।

এই সমবায় ধারনাই দেশকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমবায় ধারণাকে টাকা ধার দেওয়ার মহাজনী কায়দার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে ব্যাপ্তি দিতে চেয়েছিলেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই সমবায় নীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চাষী ও কর্মিক মানুষদের সমাজের মূল কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত করে দেশের আর্থসামাজিক ভিত্তিকে মজবুত করতে, তাদের যাবতীয় উন্নতিকে সূচিত করতে, মানবিক সম্পদের পুনরুদ্ধারে, অসাম্যকে দূর করে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে সমবায় নীতির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথের ব্যাপ্তিকে স্পর্শ করতে পারেনি বলে আজও সমবায় ধারণাকে আমরা বৃহত্তর ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখিনা। আজও সমষ্টিগত ধারণার সঙ্গে শিক্ষা সংযুক্ত হয়নি। লোভ, অশিক্ষা স্বার্থ আজও পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছে। আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে বৃহত্তর সমবায় ধারণা আজও নেই। এর কারণ হয়তো হতে পারে পর্যাপ্ত শক্তি ও পদক্ষেপ গ্রহণ করার মত যোগ্য নেতৃত্বের অভাব। যা আজও আমরা টের পাই।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 40
Website: https://tirj.org.in, Page No. 301 - 308
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Reference:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চিত্রা, আদি ব্রাহ্ম সমাজ যন্ত্র, ৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলকাতা, ফাল্গুন, ১৩০২, পৃ. ১৯

২. চক্রবর্তী, পরিমল, গ্রামোন্নয়নে মনীষীরা, রত্না বুক এজেন্সী, ৬১ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ- ডিসেম্বর, ১৯৬০, পৃ. ৩২

৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী (দশম খণ্ড), ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা- ১৭, প্রথম প্রকাশ- পৌষ, ১৩৯৬, পৃ. ৬৮১

৪. তদেব, পৃ. ৬০১

৫. চক্রবর্তী, পরিমল, গ্রামোন্নয়নে মনীষীরা, রত্না বুক এজেন্সী, ৬১ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ- ডিসেম্বর, ১৯৬০, পৃ. ৩৬

৬. তদেব, পৃ. ৩৬-৩৭

৭. তদেব, পৃ. ৩৭

৮. তদেব, পৃ. ৩৩

৯. তদেব, পৃ. ৩৯

১০. বসু, অরুণকুমার (সম্পাদনা), রবীন্দ্র প্রসঙ্গ, পঁচিশোত্তর জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত প্রবন্ধ-সংকলন, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পরিমার্জিত সংস্করণ- কলকাতা বইমেলা, মাঘ, ১৪০৩, পৃ. ৩৫

১১. তদেব

১২. তদেব

১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্দশ খণ্ড), ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা- ১৭, প্রথম প্রকাশ- পৌষ, ১৩৯৬, পৃ. ৩১৪

১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী (দশম খণ্ড), ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা- ১৭, প্রথম প্রকাশ- পৌষ, ১৩৯৬, পৃ. ৫৬২

১৫. তদেব, পৃ. ৫৬৭

Bibliography:

চৌধুরী, অমিতাভ, জমিদার রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রিট, কলকাতা- ৭১, ২৫শে বৈশাখ, ১৩৮৩

চক্রবর্তী, পরিমল, গ্রামোন্নয়নে মনীষীরা, রত্না বুক এজেন্সী, ৬১ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ- ডিসেম্বর, ১৯৬০

চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণানন্দ, কবি ও কর্মী রবীন্দ্রনাথ ও কালীমোহন ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০৭৩, মাঘ, ১৩৬৭

দাস, ক্ষুদিরাম, সমাজ প্রগতি রবীন্দ্রনাথ, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ধব এল এল বি ইউ এন ধব য্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা- ১২, প্রথম প্রকাশ- ১৯৫৮

বসু, অরুণকুমার (সম্পাদনা), রবীন্দ্র প্রসঙ্গ, পঁচিশোত্তর জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত প্রবন্ধ-সংকলন, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পরিমার্জিত সংস্করণঃ কলকাতা বইমেলা, মাঘ, ১৪০৩

ব্যানার্জি, শ্রীজয়দেব, ভারতের ও বিদেশের সমবায়, টেকনিক্যাল পাবলিশার্স, ৬০, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা- ৯, প্রথম প্রকাশ- বৈশাখ, ১৩৬৬

মুখোপাধ্যায়, ড অরুণকুমার, রবীন্দ্র-মনীষা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, সি ২৯-৩১ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা- ৭০০০০৭, প্রথম সংস্করণ- এপ্রিল, ১৯৬০

রফিক, আহমেদ, আরেক কালান্তরে, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ- ভাদ্র, ১৩৭৮

রায়, সত্যেন্দ্রনাথ (সম্পাদনা), রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ শিক্ষাচিন্তা রবীন্দ্ররচনাসংকলন, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০৭৩, তৃতীয় প্রকাশ- ১৫ই চৈত্র, ১৪০৮

সেনগুপ্ত, নন্দগোপাল, রবীন্দ্র চর্চার ভূমিকা, ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা- ৯, প্রথম প্রকাশ- ২৫ শে বৈশাখ, ১৩৬৮